Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্য ও দর্শন

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গালিব আহসান খান
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.1
Pages	১-১২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য ও দর্শন

গালিব আহসান খান*

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজ, সভ্যতা ও মানবজীবনের নানা তথ্যচিত্র ও রূপরেখা আমরা পেয়ে থাকি। দর্শনের মধ্য দিয়েও সমাজ, সভ্যতা ও মানবজীবনের ধরন, গঠন, আদর্শ ও মূল্যবোধ বিষয়ক নানা রূপরেখা আমরা পেয়ে থাকি। এভাবে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সাদৃশ্য রয়েছে। মূল পার্থক্যটা হলো যে, একটা হলো গল্পের মতো এবং অন্যটা হলো তত্ত্বমূলক। কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিন্নতার কারণে প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তবে এ সম্পর্কের মধ্যে কিছু সংকটও তৈরি হয়েছে। সাহিত্য যেহেতু শিক্ষার সূচনামূলক মূল ভিত্তি এবং একইসাথে এখানে কল্পকাহিনিও থাকে, তাই দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন প্রশ্নও উঠেছে যে, সাহিত্যের মধ্যে সত্য এবং বাস্তবতার ভুল চিত্র ও অনৈতিকতাও থাকে কিনা। সাহিত্য ও দর্শনের সম্পর্কের এ দিকটি আমি এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছি কিছু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের আলোকে। আমি মনে করি যে, সাহিত্যের মধ্যে সত্যের বিচ্যুতি কিছু ঘটতে পারে, কিন্তু এটা সাহিত্যের ত্রুটি নয়, সাহিত্যিকের ত্রুটি। আমি এটাও মনে করি যে, সত্য বলতে দর্শনে যা বুঝানো হয়, সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য নয়; 'সত্য' প্রত্যয়ের দার্শনিক অর্থ এবং সাহিত্যের অর্থ ভিন্ন প্রকৃতির এবং এই ভিন্নতা সঠিক। পরিশেষে নৈতিকতার সচেতনতা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহিত্য যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটাও আমি এ লেখায় তুলে ধরেছি।

১.

জ্ঞানের যে নানা শাখা রয়েছে তার মধ্যে, আমার মতে, সাহিত্য হচ্ছে প্রাচীনতম শাখা। আদি যুগে মানুষ যখন প্রথম কথা বলতে শিখেছে তখন সেটাই ছিল ভাষায় প্রকাশিত মনের কথা, আরো একটু বেশি করে বললে, মনের ভাব। এরই মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসের আদিতম যে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে ওঠে সেটা ভাষায় প্রকাশিত বাস্তবের তথ্যচিত্র; এবং সাহিত্য হচ্ছে বাস্তবের তথ্যচিত্রেরই ভাষাগত প্রকাশ। বাস্তবের

*অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত), দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষাগত প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমরা পাই এমন কথা যে, 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার...'; এমন কথাও পাই, '... মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে দে...'। এভাবে ক্ষুধার্তের বোধ থেকেও সাহিত্য চলে আসে, চাঁদ হয়ে যায় ঝলসানো রুটি। এই বাস্তব চিত্রের ভিত্তিতে আমার মূল কথাটা হলো যে, মানুষ বেঁচে থাকলে তার মধ্যে ক্ষুধার্তের বোধ, চাওয়া-পাওয়ার বোধ এবং ভালোবাসার বোধ থাকবেই। আর এসবের ভাষাগত প্রকাশ দিয়েই সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মানুষের জাগতিক অস্তিত্বের সূচনার পর মানুষ যখন কথা বলতে শিখেছে এবং ভাষার ব্যবহার শিখেছে তখন থেকেই তথ্যচিত্রের সাহিত্যিক প্রতিফলন শুরু হয়েছে। এভাবেই মানব ইতিহাসের আদিতে আমরা পেয়েছি পালি, সংস্কৃত সাহিত্য এবং হোমার ও হেসয়েডের সাহিত্য, যদিও সে সময়ে জ্ঞানের অন্য কোনো শাখার উদ্ভব ঘটেনি।

সাহিত্যের উদ্ভবের পরই উদ্ভব ঘটেছে দর্শনের। উভয় ক্ষেত্রেই থাকে জীবনবোধ এবং মনের ভাব। সাহিত্যের মধ্যে দর্শনের জীবনবোধ ও মনের ভাব কখনো থাকে সুপ্ত আকারে, আবার কখনো থাকে প্রকাশ্যে। এ দুয়ের ধারাবাহিক বিকাশের এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে সাহিত্যের দর্শন। সাহিত্য বিষয়ক দার্শনিক চিন্তার কিছু দিক আমি তুলে ধরবো এখানে।

সাহিত্য বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় প্লেটোর রচনায়। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র বিষয়ে আলোচনা করেন। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণিকে আদর্শ মানুষ হতে হবে। প্লেটো মনে করেন যে, এর মূল ভিত্তি হবে শিক্ষাব্যবস্থা। আদর্শ মানুষ হবার জন্যে শিশুকালে থাকতে হবে ভালো শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভালো শাসক হবার জন্যে শাসক শ্রেণির জন্যেও থাকবে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু প্লেটোর সে সময়ে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সাহিত্য, কারণ, উপরোক্ত আলোচনায় যেটা উল্লেখ করেছি, জ্ঞানের শাখা হিসেবে সাহিত্যের সূচনা ছিল সবার আগে; দর্শনের সূচনা হবারও পূর্বে আমরা পাই গ্রিক কাব্য সাহিত্যিক হোমার এবং হেসোয়েডের কাব্য রচনা, যা ছিল সে সময়ের শিক্ষার মাধ্যম। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটো সাহিত্য বিষয়ে কিছু মতাদর্শ তুলে ধরেন তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে।

সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়টির ওপর প্লেটো গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো সত্য-মিথ্যার দিকটি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পাবে তা মিথ্যা হলে গ্রহণযোগ্য হবে না, সত্য হলে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হোমার এবং হেসয়েডের কঠোর সমালোচনা করেন প্লেটো। প্রথম সমালোচনাটি হলো যে, হোমার এবং হেসয়েডের সাহিত্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তা সত্য নয়; দ্বিতীয় সমালোচনাটি হলো যে, হোমার এবং হেসয়েডের সাহিত্য মানুষের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে খারাপ এবং ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর চিন্তা হলো যে, 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন আছে : সাহিত্য সত্য হতে পারে; সাহিত্য অ-সত্যও হতে পারে' (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১০)। প্লেটো আরো বলেন যে,

> ... শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হচ্ছে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যবস্থানুযায়ী যে কাহিনী শিশুদের জন্য উত্তম হবে, কেবল সে কাহিনী শিক্ষার অনুমতি দেয়া হবে। যে কাহিনী উত্তম নয় সে কাহিনী নাকচ করা হবে। শিশুর জননী আর ধাত্রীর প্রতিও নির্দেশ থাকবে ... তারা যত্নের সঙ্গে শিশুর তুলতুলে শরীরকে যেমন তৈরি করে, তার চেয়েও যত্নের সঙ্গে এই উত্তম গল্পের শিক্ষায় শিশুদের নরম মনকে তৈরি করে তুলবে। কিন্তু বর্তমানে যেসব কল্পকথা আছে তার বেশির ভাগই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১১)।

'বর্তমানে যেসব কল্পকথা আছে' বলতে প্লেটো মূলত হোমার, হেসয়েড এবং তাঁদের অনুসারীদের কাব্য রচনাকে বুঝিয়েছেন। কাব্য রচনায় সে সময়ে যে মিথ্যা ছিল এবং পরিত্যাগ করার মতো বর্ণনা ছিল তার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্লেটো হেসয়েডের *থিওগনি* (*Theogony*) গ্রন্থ থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। প্লেটো বলেন যে, *থিওগনি* গ্রন্থে ইউরেনাস সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইউরেনাসের বিপক্ষে ক্রোনাসের প্রতিশোধমূলক কাজের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল মিথ্যা নয়, বরং নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যা; একইসাথে ক্রোনাসের কার্যকলাপের জন্যে তার ওপর তার পুত্র যে প্রতিশোধ নিয়েছিল সেই বর্ণনাও আছে। এই তথ্য উল্লেখ করে প্লেটো বলেন যে, এ কাহিনি যদি সত্য হয় তা হলেও তরুণ এবং চিন্তার ক্ষমতাশূন্য যারা তাদের কাছে এ কাহিনি হালকাভাবে বর্ণনা করা সঙ্গত নয়; সম্ভব হলে এ কাহিনিকে নৈঃশব্দের আবরণে ঢেকে রাখাই কর্তব্য (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১২)। ক্রোনাসের পুত্র কর্তৃক পিতার ওপর প্রতিশোধ নেবার প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন যে, 'রাষ্ট্রের তরুণদের মনে এই মনোভাব সৃষ্টি করা চলবে না যে, পিতার ত্রুটি সংশোধনের নামে পিতাকে অসম্মানিত করার ন্যায় গর্হিত অন্যায় কার্য আসলে অন্যায় নয় ...' (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১৩)।

তরুণদের এবং শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ চিত্রের কাব্যরূপ বিষয়ে প্লেটোর উপরোক্ত মতাদর্শের পাশাপাশি রয়েছে রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির জন্যে উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাহিত্যের মূল্যায়নের দিকটি। এটা সত্য যে, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে এক ধরনের বিরোধ থাকতে পারে। প্লেটোর সময়ের নগর রাষ্ট্রগুলোতে তখন এমন বাস্তবতা ছিল; পরবর্তী সব যুগেই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদ লক্ষ করা গেছে। এ ধরনের বাস্তবতার চিন্তা চেতনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন থেকে মুছে দেবার উদ্দেশ্যে প্লেটো বলেন যে, 'আমরা যদি চাই যে, আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রক্ষকগণ আত্মকলহকে সবচেয়ে খারাপ বলে মনে করবে, তাহলে স্বর্গের দেবতাদের আত্মকলহ, একের বিরুদ্ধে অপরের ষড়যন্ত্র এবং একের সঙ্গে অপরের লড়াই-এর যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সঙ্গেও আমাদের তরুণদের পরিচিত হতে দেওয়া চলবে না' (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১৩)। এই কথার মধ্য

দিয়েই প্লেটো হোমারের কাব্য রচনার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন; হোমারের কাব্যে দেবতাদের সম্পর্কে এমন বর্ণনাও আছে যে, দেবতাদের দল বৈদেশিকের বস্ত্র ধারণ করে বিচিত্র রূপে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে এবং বিচিত্র বেশে রাতের আঁধারে ঘুরে বেড়ায় (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১৮)। প্লেটোর এই মতাদর্শের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের সমালোচনা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের দীনতার দিকটিও প্রকাশিত হয়। প্লেটো মনে করেন যে, এমন রচনার মধ্য দিয়ে বিধাতার অবমাননা করা হয়, যা বাঞ্ছনীয় নয়। প্লেটোর মতে এমন অবাঞ্ছনীয় বিষয় শিক্ষার বিষয় হতে পারে না।

প্লেটোর এই মতাদর্শে সাহিত্য বিষয়ে দুটো অভিযোগ রয়েছে; একটি হলো যে, সাহিত্যে মিথ্যাকে তুলে ধরা হয় এবং অন্যটি হলো যে, এর মধ্য দিয়ে অনুচিত এবং অনৈতিক কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য এবং নৈতিকতার দিকটি বিবেচনা করার জন্যে প্রথমে এ দুটো দিকের দার্শনিক মতাদর্শ তুলে ধরতে হবে। সত্য বিষয়ে প্লেটো পৃথকভাবে কোন মতাদর্শ উপস্থাপন করেননি। প্রথমে আমি সত্য বিষয়ে প্রচলিত মতাদর্শ তুলে ধরবো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটোর মতাদর্শের এবং সাহিত্যের দিকটি আমি বিবেচনা করবো।

২. সত্য ও সাহিত্য

দর্শনের ইতিহাসে সত্য বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব আমরা পেয়েছি। এগুলো হলো অনুরূপতাবাদ (correspondence theory), সঙ্গতিবাদ (coherence theory) এবং প্রয়োগবাদ (pragmatism)। অনুরূপতাবাদ অনুযায়ী কোন বচনে যে তথ্য প্রকাশিত হবে তা যদি বাস্তবতার অনুরূপ হয় তাহলে সেটাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করবো। যেমন, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, এই বচনটি বাস্তবের অনুরূপ এবং এটা সত্য। যদি বলি যে, বরফ শীতল পদার্থ, অগ্নি হলো অতি উচ্চতাপ যুক্ত এবং যদি বলি যে, মানুষ হলো মরণশীল, তাহলে আমরা দেখব যে এই তিনটি বচনের প্রতিটিই বাস্তবতার অনুরূপ এবং এগুলো হলো সত্য। এই মতবাদটির সমস্যা হলো যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই বিষয়ের বাস্তবতা স্থান এবং সময়ের ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। অথবা বাস্তবতার পর্যবেক্ষণের ভিন্নতার কারণে একই বস্তু বা বিষয় ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে বচনের সত্যতার দাবির ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে এবং বচনের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যেতে পারে।

অন্যদিকে সঙ্গতিবাদ অনুযায়ী একটি বচনকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে যখন দেখা যাবে যে, সত্য বলে গৃহীত অন্য বিবিধ বচনের সাথে ওটা সঙ্গতিপূর্ণ। এটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন সত্য বচনের সাথে যে বচন সঙ্গতিপূর্ণ হবে সেটা সত্য হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনও হতে পারে যে, ভাষার ব্যবহারের দক্ষতা দিয়ে কৌশলে একটি বচন তৈরি করা হলো যা মিথ্যা, যদিও তা অন্য সত্য বচনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

মনে হবে। এমনও হতে পারে যে, একটি কল্পকাহিনি এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যা পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ যদিও তা সত্য নয়। এ দিক থেকে সঙ্গতিবাদ তত্ত্বেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রয়োগবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী যা আমাদের জন্যে উপযোগী বা আমাদের কার্যক্রমের জন্যে প্রয়োজনীয় (useful) সেটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এখানেও সমস্যা হলো যে, বাস্তবে কখনো মিথ্যাও কারো জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে যায়। কোনো অপরাধীর জবানবন্দীমূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে অপরাধীকে মিথ্যা বলে ভীতি প্রদর্শন করে যদি অপরাধীর কাছ থেকে সত্য জবানবন্দী প্রকাশ করানো যায় তাহলে এখানে মিথ্যাকেও প্রয়োজনীয় বা উপযোগী বলা যাবে সত্য প্রকাশ করানোর জন্যে। এক্ষেত্রে মিথ্যার উপযোগিতার কারণে মিথ্যাকে কি সত্য বলা যাবে? লোভী ব্যক্তির নিকট মিথ্যা প্রয়োজনীয় বা উপযোগী হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা কখনো সত্য হতে পারে না। প্রয়োগবাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যা উভয়ের উপযোগিতা এ মতাদর্শের জন্যে সঙ্কট তৈরি করে।

সত্য বিষয়ক উপরোক্ত তিনটি দার্শনিক মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার ভিত্তিতে আমি বলবো যে, প্লেটোর উপরোক্ত আলোচনায় সাহিত্যের যে দিকগুলোর বিরোধিতা করা হয়েছে সেখানে সত্য বিষয়ক তিনটি দার্শনিক মতাদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে। দেবতাদের সম্পর্কে হোমার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শিশু এবং তরুণদের জন্যে উপযোগী হবে না। গীতিকাব্য প্রসঙ্গে প্লেটো এটাও বলেছেন যে, 'বিধাতাকে তার যথার্থ রূপেই প্রকাশ করতে হবে' এবং 'বিধাতার রূপ হচ্ছে উত্তম' (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ১১৪)। বিধাতার রূপ এমন হলে হোমারের কবিতায় দেবতাদের আত্মকলহের বর্ণনা বিধাতার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না এবং এই বর্ণনা অনুরূপতাবাদের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। হেসয়েডের *থিওগনি* গ্রন্থে ইউরেনাস, ক্রোনাস এবং ক্রোনাসের পুত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে সেটাও প্রয়োগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। সাহিত্য বিষয়ে এমন সমালোচনার সাথে প্লেটো ঢালাওভাবে এটাও বলেছেন যে কাব্য সাহিত্য নির্বিশেষেই এমন যে তা সত্য নয়। এ বিষয়ে তিনি একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

কবিগণ যে রচনা করেন সে বিষয়ে প্লেটো বলেন যে, 'কবিদের এই সৃষ্টি সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরে অবস্থিত : এরা সত্যের ছায়ামাত্র, সত্য নয়' (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ৪৭৪-৭৫)। 'তিন প্রস্ত দূরে' বলতে প্লেটো যা বোঝাতে চেয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি শিল্পীদের শিল্পকর্মের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এবং কবিদের রচনাকেও শিল্পীদের শিল্পকর্মের অনুরূপ বলে দাবি করেছেন।

শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে একজন শিল্পী যা সৃষ্টি করেন তার মূলে থাকে একটি বিষয় যাকে শিল্পকর্মে রূপ দেয়া হয়। এই মূল বিষয়টিকে শিল্পী তার প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন। এভাবে মূল বিষয়টির একটি ছাপ শিল্পীর মধ্যে তৈরি হয়। শিল্পীর

মনে সৃষ্ট এই ছাপকে প্লেটো বলেছেন প্রতিরূপ। শিল্পীর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই প্রতিরূপকে যখন তিনি ভাষায় কাব্য আকারে প্রকাশ করেন তখন সেটা হয় প্রতিরূপটির একটি প্রতিরূপ। এভাবে শিল্প কর্মে আমরা পাই তিনটি স্তর; প্রথমে থাকে মূল সত্তা, এরপর থাকে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট একটি প্রতিরূপ এবং তৃতীয়ত থাকে প্রতিরূপটির প্রকাশ, প্লেটো যেটাকে বলেছেন প্রতিরূপের প্রতিরূপ। প্লেটোর মতে মূল সত্তা এবং প্রতিরূপ অভিন্ন নয় — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; মূল সত্তাকে জানা এবং মূল সত্তার প্রতিরূপকে জানা এক নয়। প্রত্যক্ষণ-পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে যে কাব্য তৈরি হয় সেটা হলো প্রতিরূপের প্রতিরূপ। এভাবে আমরা তিনটি প্রস্ত পাই, যা হলো মূল সত্তা, মূল সত্তার প্রতিরূপ এবং এই প্রতিরূপের প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত প্রতিরূপের প্রতিরূপ। শেষ প্রান্তটি হলো শিল্প বা সাহিত্য। এ কারণেই প্লেটো বলেছেন যে, এমন সৃষ্টি সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরে থাকে (সরদার [অনূদিত] ২০০২, ৪৭১-৭৭)।

প্লেটোর মতাদর্শের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেবো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা / কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৭৬, ৭)। কবিতাটিতে যা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয় এমন অভিযোগ করা যেতে পারে। কারণ, কবিতাটি লেখা হয়েছিল ফাল্গুন মাসে। শীত কাল শেষ হয় মাঘ মাসে, ঠিক তার পরেই ফাল্গুন মাসে গগনে মেঘ গর্জন করবে — এটা বাস্তবতা নয়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এ কবিতাটির কথা মিথ্যে বলে কেউ দাবি করতে পারেন। এভাবে এ কবিতাটি নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি পত্রে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীত স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ...' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৭৬, ৬৩৭)। এখানে লক্ষণীয় যে, প্লেটো কবিতাকে বলেছেন মূল সত্তার প্রতিরূপের প্রতিরূপ (বা প্রকাশ)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় ভিত্তি হিসেবে বাস্তবের বা মূল সত্তার প্রতিরূপ আছে, যদিও প্রতিরূপের প্রতিরূপ নেই — কারণ অনাগতের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ কোনোকিছুর প্রতিরূপ নয় বরং নতুন কিছুর অপেক্ষা। কবিতা বিষয়ে প্লেটোর মতাদর্শ রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইসাথে প্লেটো কবিতাকে যেভাবে সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরে বলেছেন এবং মিথ্যা বলেছেন, তাও এখানে প্রযোজ্য নয়। অনাগতের প্রত্যাশা সত্য বা মিথ্যার বিষয় নয়, কামনা-বাসনার বিষয়। "সোনার তরী" কবিতাটিকে আমরা কীভাবে বুঝবো বা গ্রহণ করবো তার জন্যে কবিতাটির অর্থের ব্যাখ্যাও আবশ্যক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটির একটি ব্যাখ্যাও কবি দিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৩৭৬, ৬৩৮-৩৯)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্লেটো কবিতাকে বলেছেন মূল সত্তার প্রতিরূপের প্রতিরূপ, যদিও রবীন্দ্রনাথের

এ কবিতাটি মূল সত্তার প্রতিরূপের এক ধরনের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকে ভুল বলা যেতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বলা হয় না।

একইভাবে বিবেচনা করা যায় রবীন্দ্রনাথের "প্রথম দিনের সূর্য" কবিতাটিকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, (রবীন্দ্রনাথ ১৩৭৭, ৪৯)

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে —
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।

এই কবিতাটিও হলো কবিতা বিষয়ক প্লেটোর মতাদর্শের একটি ব্যতিক্রম। প্লেটোর কবিতার ভিত্তিতে যেখানে থাকে একটি মূল সত্তা এবং কবির মনে সৃষ্ট তার একটি প্রতিরূপ, সেখানে এই কবিতাটিতে রয়েছে দুটো মূল সত্তা, একটি হলো সূর্য এবং অন্যটি হলো নতুন আবির্ভূত সত্তা। কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে এই দুই সত্তার মধ্যে প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তরের নীরবতা — যা হলো এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; এই কবিতাটির পুরো বিষয়টি হলো মনের ভাব এবং দার্শনিক চিন্তা, অন্য কিছুর প্রতিরূপ নয়, এবং এখানে সত্য-মিথ্যার বিষয়টি অবান্তর।

কবিতাকে মিথ্যা বলার প্লেটোর মতাদর্শের বিপক্ষে জোরালো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। যেমন, চাঁদকে মামা বলা বা সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন লিখেছেন, 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি' (বদরুদ্দীন ও রণেশ [সংকলিত] ১৩৭৭, "হে মহাজীবন") — এসবকে মিথ্যা বলে কবিতা লেখার কোনো সমালোচনা করা হয়নি বা এগুলোকে মিথ্যা বলে বর্জন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতার কথাও উল্লেখ করবো। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ... (রণেশ [সম্পাদিত] ১৩৭৯, ১৪৭)

এটা কি সত্য হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি হাজার বছর ধরে ক্রমাগত পথে হেঁটে চলেছেন? কবিতাকে মিথ্যা বলে বর্জন করার প্লেটোর মতাদর্শ অনুযায়ী এ কবিতাটিও বর্জনযোগ্য। কিন্তু এই কবিতাটি প্রকাশ হবার পর আজ পর্যন্ত কেউ কি এটাকে মিথ্যা বলেছেন? আমার জানা মতে এমন কেউ বলেননি এবং এ কবিতাটি একটি অসাধারণ এবং অতি জনপ্রিয় কবিতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান — জ্ঞানের এমন প্রতিটি শাখারই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকবে; 'সত্য' প্রত্যয়ের অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এক অর্থে ব্যবহৃত হবে না

বরং ভিন্ন রূপ নেবে, এমন মনে করার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নেই। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে শিল্প-সাহিত্যের সত্য বিষয়ে ভিন্ন মতাদর্শের একটি দিক এখানে আমি তুলে ধরবো।

৩. সাহিত্যের সত্য

'সত্য' প্রত্যয়টি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়। জ্ঞানের সংজ্ঞার আলোচনায় এটা বলা হয়েছে যে, যা মিথ্যা তা জ্ঞান হতে পারে না, জ্ঞান হতে হলে তাকে সত্য হতে হবে। সত্য বিষয়ক এই আলোচনা আমরা পাই দর্শনের শাখা জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) মধ্যে। দর্শনের অপর শাখা যুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতেও রয়েছে সত্যের ভূমিকা। যুক্তিকে বৈধ হতে হলে যুক্তি গঠনের বচনগুলো এবং সিদ্ধান্ত সত্য হতে হবে। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যকে আবিষ্কার করা। ভাষায় প্রকাশিত বচনের মধ্য দিয়ে যা স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তারই সত্য-মিথ্যার দিকটি হলো জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার মূল বিষয়। এভাবে বিষয়টি মূলত ভাষার ব্যবহারের সাথে যুক্ত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যের ধারণাকে এভাবে যুক্ত করা যাবে না। ইংরেজি শব্দ language এবং literature যদি বিবেচনা করি তাহলে বলা যাবে যে, language এবং literature হলো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। একইভাবে বলবো যে, ভাষা এবং সাহিত্য এক নয়। এভাবেই বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং বাংলা সাহিত্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন বলবো যে, উপরে আলোচিত সত্য বিষয়ক প্রচলিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ধারণা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য নয়। 'মানুষ হলো মরণশীল' — এ বচনটির মধ্যে 'মানুষ' এবং 'মরণশীল', এ দুয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। 'মানুষ হলো মরণশীল' বচনটি সত্য 'মানুষ' এবং 'মরণশীলতার' সম্পর্ক সঠিক বলে। কিন্তু যদি বলি যে, 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি' — তাহলে এখানে দেখবো যে, 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-এর সাথে 'ঝল্‌সানো রুটি'-র কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণেই কবিতার এ কথাটিকে মিথ্যা বলা যাবে না এবং প্রচলিত অর্থে সত্যও বলা যাবে না — যদিও সাহিত্যের সুন্দর প্রকাশ এটি। একই সাথে 'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' — দর্শনের প্রচলিত অর্থে এটাকেও সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই বলা যাবে না। কাব্য-সাহিত্যকে প্লেটো যেভাবে মিথ্যা বলেছেন তা যথার্থ নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যতার দিকটিকে বিবেচনা করা এবং উদঘাটন করার একটি উপায় হলো বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা (interpret) করা (Adorno 1984, 186-7)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণিমা-চাঁদ ঝল্‌সানো রুটি হবার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্যে প্রথমে এ কথাটির অর্থকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে। এটা কার নিকট ঝল্‌সানো রুটি মনে হয়? যিনি ক্ষুধার্ত, একটি রুটি খাবার জন্যে যিনি অপেক্ষায় আছেন, তার কাছে। পূর্ণিমা-চাঁদ দেখে এমন কেন মনে হলো? কারণ, পূর্ণিমা-চাঁদ

রুটির মতোই গোলাকার, পৃথিবী থেকে দেখে মনে হবে তার আয়তন রুটির মতোই এবং ঝল্‌সানো রুটিতে যেমন কিছু ঝলসে যাবার হালকা ছাপ থাকে পূর্ণিমা-চাঁদেও তেমন হালকা ঝাপসা ছাপ থাকে। অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্যে এমন একটা সাদৃশ্য রয়েছে যে এর একটিকে দেখলে অন্যটির কথা মনে হতে পারে। এবং শেষ প্রশ্ন, কবি কেন এই সাদৃশ্যমূলক উপমা দিলেন? এর উত্তর হলো, অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষের বেদনাকে তুলে ধরার একটা মানবতাবাদী বোধ এবং এর মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের পক্ষে মার্কসবাদী দর্শনের একটি প্রতিফলন ঘটানোর জন্যেই সুকান্ত এমন উপমা দিয়েছিলেন। সাহিত্যকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সাহিত্যের এমন ব্যাখ্যা আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

সুকান্তের কবিতার এ কথাটির এই ব্যাখ্যা থেকে এটা মনে হবে যে, এটা যেন একটা সদর্থক, মানবতামূলক এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমামূলক বাস্তবতারই একটি চিত্র এবং এখানে অসত্যের কিছু নেই। এই চিত্রকে সত্য বলা যেতে পারে, অথবা এটাকে বাস্তব সত্যের একটা প্রতিফলনও বলা যেতে পারে। ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাহিত্যের সত্যকে এভাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, এটা সাহিত্যের সত্য, দর্শনের প্রচলিত অর্থের সত্য নয়।

সাহিত্যের সত্যকে আরো একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। সাহিত্য হলো এক ধরনের জীবন-চিত্র; সমাজ, সংসার এবং ব্যক্তি মানুষের জীবনের যে নানা রূপ, যেখানে আছে দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-আশা এবং সব মিলিয়ে আসা-যাওয়া — এ সব মিলিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্যের কথা, মানুষের জীবন-চিত্র। এভাবে সাহিত্য বিষয়ে মনে করা হয় যে, মানব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা সত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই সত্য (truth to human nature) (Edwards 1972, vol.1, 49)। উপরের আলোচনায় সুকান্তের কবিতার যে ব্যাখ্যা আমি তুলে ধরেছি তা মানব-প্রকৃতিগত সত্যেরই প্রতিরূপ। একইভাবে যদি আমরা রূপকথা বা কল্পকাহিনি (fiction) বিবেচনা করি তাহলে দেখবো যে, মানুষ এগুলোকে পছন্দ করে এবং এসব থেকে আনন্দ উপভোগ করে। রূপকথা এবং কল্পকাহিনির জনপ্রিয়তা এবং সাহিত্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হবার সদর্থক দিকটির মূলে রয়েছে মানব-প্রকৃতির সত্যতার সাথে এসবের মিল থাকা। এটাও হলো সাহিত্যের সত্য — ভাষা বা দর্শনের সত্য নয়।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যাও রয়েছে। মানব-প্রকৃতি মৌলিকভাবে দুপ্রকারের হতে পারে — ভালো এবং মন্দ, এই দুপ্রকারের। বাস্তবে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষও আছে, শুভ আছে এবং অশুভও আছে, রবীন্দ্রনাথ যেমন পৃথিবীকে শুভে-অশুভে স্থাপিত পাদপীঠ বলেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৩৭৪, ১২-১৬। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকে কবিতার জন্যে মানব-প্রকৃতি তৈরি করতে পারে কিছু নৈতিক সংকট। এ দিকটির ওপর এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করবো।

৪. সাহিত্য ও নৈতিকতা

সাহিত্যের সাথে নৈতিকতার যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকালে যখন ছড়া এবং কবিতা দিয়ে শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তখন কাব্য-সাহিত্য ভিত্তিক এই শিক্ষা মানুষের মনকে গড়ে তোলে একজন ভালো মানুষ হবার লক্ষ্যের দিকে। কবি জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দাশ "আদর্শ ছেলে" শিরোনামে লিখেছিলেন নৈতিক শিক্ষামূলক একটি অসাধারণ কবিতা, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সনে *মুকুল* পত্রিকায়। কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করবো (ক্লিন্টন ২০১১, ২৫-২৬)।

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ হইতে হবে' — এই তার পণ।
....
হাতে প্রাণে খাট সবে, শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

পুরো কবিতাটির প্রতিটি পঙক্তিতে রয়েছে নৈতিক প্রেরণামূলক কথা। একইভাবে সমাজ সংস্কারমূলক যে গদ্য সাহিত্য আমরা পাই সেখানেও থাকে আদর্শের কথা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত *লালসালু* উপন্যাসের কথা, যা নৈতিক মূল্যবোধের দিক থেকে সমাজ সংস্কারের পথে সহায়ক হবে।

সাহিত্য ও নৈতিকতার এমন সম্পর্ককে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে (Edwards 1972, vol. 1, 50)। প্রথমত, নৈতিক আদর্শের ও মূল্যবোধের দিকটি সাহিত্যকে জোরালো করতে পারে; বলা হয়েছে যে, নৈতিকতা হবে সাহিত্যের পরিচারিকা (handmaiden)। দ্বিতীয়ত, নৈতিক চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরে নৈতিকতাকে জোরালো করবে সাহিত্য; অর্থাৎ সাহিত্য হবে নৈতিকতার পরিচারিকা। তৃতীয়ত, সাহিত্য এবং নৈতিকতা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়েই পারস্পরিকভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু সমস্যাটা হলো যে, যা উপরে উল্লেখ করেছি, ত্রুটিযুক্ত মানব-প্রকৃতির কারণে সাহিত্য বা কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে অনৈতিক কিছু ঘটতে পারে। যেমন, মানবতাবোধকে হেয় করে অনৈতিক কার্যক্রমকে নান্দনিকভাবে প্রকাশের নামে কবিতা লেখার ব্যঙ্গ-তামাশা ঘটতে পারে। এমনটা ঘটেছিল ১৯৩০-এর দশকে ইতালির রাষ্ট্রপতি মোসোলিনির সময়ে। আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় নিরস্ত্র জনগণের ভিড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণ ও মানুষ হত্যার এই দৃশ্যের বর্ণনা করে কবিতা লিখেছিলেন মোসোলিনির জামাতা;

তিনি এটা করেছিলেন তার বর্ণনাকে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করার জন্যে (Edwards 1972, vol. 1, 50)। কিন্তু মানুষ হত্যার দৃশ্য কি নান্দনিক হতে পারে? নান্দনিকতার এমন চর্চা হলো বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের এক কবি লিখেছিলেন যে, তাকে ভাত দেওয়া না হলে তিনি মানচিত্র খাবেন; অন্য একজন কবি এর সমালোচনাও করেছিলেন (খোন্দকার ১৯৯৪, ১৬০)। এখানে আমার মূল কথাটা হলো যে, সমস্যাটা কবিতা বা সাহিত্যের মধ্যে নয়, সমস্যাটা হলো ব্যক্তি বিশেষের অস্বাভাবিক ও অনৈতিক মন-মানসিকতার মধ্যে। স্বাভাবিক মানুষের সাহিত্য চর্চার মধ্যে সাহিত্য ও নৈতিকতার সম্পর্ক সমন্বিত ও সহাবস্থানের মধ্যেই থাকবে। মানুষের শিক্ষা ভালো সাহিত্য দিয়েই হবে।

৫. উপসংহার

উপরের আলোচনায় সাহিত্যের সাথে, বিশেষত কাব্যসাহিত্যের সাথে দর্শনের সম্পৃক্ততার কিছু দিকের ওপর আলোচনা করেছি। দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটো দিকের ওপর, অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যতা এবং নৈতিকতার ওপর আলোকপাত করেছি। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে আমার আলোচনার পরিসমাপ্তি করবো আমি।

দর্শনের শাখা নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয় আমাদের কার্যক্রমের ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এবং ভালো-মন্দের দিকগুলো নিয়ে। মানব জীবনের সর্বোচ্চ ভালো কী হবে এবং কীভাবে তা অর্জন করা যাবে — এসব বিষয় নিয়ে নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। কিন্তু এসব আলোচনা হলো তাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং দর্শন বিষয়ে যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন কেবলমাত্র তারাই এসব বিষয়ে অবহিত হন। কিন্তু নীতিদর্শনের তত্ত্বের আলোচনার একটা দিক হলো তত্ত্বের পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিতর্ক; এবং দর্শনের ইতিহাসের এটা মূল বৈশিষ্ট্য যে, সকল মতাদর্শেরই প্রতিপক্ষের ভিন্ন মত এবং বিতর্ক রয়েছে। এমন বিতর্ক প্রায়ই মতাদর্শ গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়। এই বাস্তবতায় দর্শন থেকে নৈতিকতাকে আমরা অন্তরে যতটুকু নিতে পারবো, সাহিত্য থেকে তারচেয়েও বেশি নিতে পারবো। কারণ, সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বাইরেও সকল মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সাহিত্যের মতাদর্শ নিয়ে বিতর্ক অনেক কম। এমন দৃষ্টিকোণ থেকে রবার্ট শার্প বলেন যে, আমরা বলতে পারি যে, সাহিত্য হলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাহিত্য চিন্তা-ভাবনাকে এমনভাবে পরিচর্যা করে যা নৈতিক নীতিমালা বা দার্শনিক মতাদর্শও করতে পারে না (Honderrich 1995, 493)। এ কথাটা সত্য। আমরা যখন শুনি যে, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়', তখনই মন থেকে ভয় দূরে সরে যায় এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাবার শক্তি আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে এবং নৈতিকভাবে আমাদেরকে জোরালো করে। সাহিত্যের মধ্যে নৈতিক শিক্ষামূলক গণনাতীত প্রবচন রয়েছে, কিন্তু এখানে যুক্তিতর্কের ধূম্রজাল নেই। নৈতিক শিক্ষামূলক আর তিনটি উক্তি সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করবো। প্রথম উক্তিটি

হলো, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে'; দ্বিতীয়টি হলো, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'; এবং শেষ উক্তিটি হলো, 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা' (রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত)।

তথ্যপঞ্জি

সরদার ফজলুল করিম [অনূদিত] (২০০২)। *প্লেটোর রিপাবলিক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৬)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* খণ্ড ৩, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৪)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* খণ্ড ২০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৭)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* খণ্ড ২৬, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

বদরুদ্দীন উমর ও রণেশ দাশগুপ্ত [সংকলিত] (১৩৭৭)। *সুকান্ত সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রণেশ দাশগুপ্ত [সম্পাদিত] (১৩৭৯)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা

ক্লিন্টন বি সিলি (২০১১)। *অনন্য জীবনানন্দ* (অনুবাদ, ফারুক মঈনউদ্দীন), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Adorno, T. W., (1984). *Aesthetic Theory.* Routledge and Kegan Paul, London

Edwards, P. [ed.] (1972). *The Encyclopedia of Philosophy*, Macmillan, New York

Honderrich, T. [ed.] (1995). *The Oxford Companion to Philosophy.* Oxford University Press, Oxford